কালের কণ্ঠ

তারিখ 30 JAN 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

পাহাড়ে প্রাথমিকে ২৫% শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে

ঝরে পড়া ঠেকাতে হলে বাড়াতে হবে প্রণোদনা ও বিনিয়োগ

ভুটান ও নেপালে বাংলাদেশের চেয়ে তিন গুণ

বেশি বিনিয়োগ করা হয় শিক্ষা খাতে

আরিফুর রহমান ▷

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজিতে প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ঝরে পড়ার হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি ছিল বাংলাদেশের। ২০০০ সালে ঘোষিত ১৫ বছর মেয়াদি এমডিজির মেয়াদ শেষ হয়েছে গত ডিসেম্বরে। নতুন করে শুরু হয়েছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি। প্রাথমিক শিক্ষায় গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের অগ্রগতি কতটুকু, তা জানতে গিয়ে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ভর্তির হার শতভাগের কাছাকাছি গেলেও ঝরে পড়ার হার গড়ে এখনো ২০ শতাংশের ওপরে। পার্বত্য ও হাওরাঞ্চলে এই হার আরো বেশি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তিতে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে বাংলাদেশ। তবে ঝরে পড়ার হার কমানো ততটা সন্তোষজনক নয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কর্মকর্তারা বলেছেন, সমতলে ঝরে পড়ার হার কম হলেও পার্বত্য জেলায় ও হাওরাঞ্চলে তা অনেক বেশি। হাওরাঞ্চল ও পার্বত্য জেলায় ভর্তির হার গড়ে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ এবং ঝরে পড়ার হার গড়ে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশের মধ্যে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বশেষ শুমারি প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বান্দরবানে ঝরে পড়ার হার ২৯ শতাংশ, খাগড়াছড়িতে ২৩ শতাংশ আর রাঙামাটিতে ২২ শতাংশ। অর্থাৎ পার্বত্য তিন জেলায় ঝরে পড়ার গড়হার ২৫ শতাংশের মতো।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ অনেক কম। সব শিশুকে স্কুলে আনা এবং ঝরে পড়ার হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে দেশে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ দরকার মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির ৬ শতাংশ। কিন্তু দেশে এখন বিনিয়োগ হচ্ছে জিডিপির ২ শতাংশের কিছু বেশি। অথচ মালদ্বীপে হচ্ছে প্রায় ৯ শতাংশ। এ

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

পাহাড়ে প্রাথমিকে ২৫% শিক্ষার্থী

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ছাড়া ভুটান ও নেপালে বাংলাদেশের চেয়ে তিন গুণ বেশি বিনিয়োগ করা হয় শিক্ষা খাতে। স্কুলে শতভাগ ভর্তি, ঝরে পড়ার হার শূন্যে নামিয়ে আনা এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই বলে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

পার্বত্য জেলায় ভর্তির হার কম এবং ঝরে পড়ার হার বেশি হওয়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পাহাড়ি এলাকা সমতলভূমির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে দুর্গম ও আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ। একজন শিক্ষার্থীকে পাহাড়ের উঁচু-নিচু আর আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে বাড়ি থেকে স্কুলে যেতে সময় লাগে দুই থেকে তিন ঘণ্টা। বর্ষাকালে পাহাড়ের অবস্থা থাকে আরো নাজুক। ফলে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে আগ্রহী হয় না।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, পার্বত্য জেলায় একসঙ্গে অনেক ভাষাভাষী মানুষের বাস। সেখানে একদিকে যেমন পাহাড়ি ও বাঙালি বসবাস করছে, পাশাপাশি মারমা, চাকমা, ত্রিপুরাসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীও রয়েছে। ফলে বাংলা ভাষার পাশাপাশি মারমা, ত্রিপুরা, চাকমাসহ অনেক ভাষার মানুষের বাস সেখানে। কিন্তু স্কুলের পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষায় রচিত। ফলে ক্লাসরুমে অন্য ভাষার শিক্ষার্থীরা কিছু বুঝতে পারে না। এ কারণে অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করতে নিরুৎসাহ হয়। আবার শিক্ষক যদি বাঙালি না হয়ে অন্য কোনো নৃগোষ্ঠীর হন, তিনিও পড়াতে ততটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না।

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান—এ পার্বত্য জেলায় বেশির ভাগ পরিবারই দরিদ্র। শিক্ষায় পিছিয়ে থাকায় অভিভাবকরাও সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে তেমন ভাবেন না। তাঁরা সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে মাঠে পাঠিয়ে দেন কাজ করতে। আবার ধারেকাছে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় না থাকায় অনেক শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণির গণ্ডি পার হতে আগ্রহী হয় না। পঞ্চম শ্রেণি পাস করে ষষ্ঠ শ্রেণিতে কোথায় ভর্তি হবে এমন যুক্তি দেখিয়ে অনেক অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের প্রাথমিক স্কুলে পাঠান না বলেও জানা গেছে। এসব কারণেই পার্বত্য জেলায় প্রাথমিকে ভর্তির হার কম এবং ঝরে পড়ার হার বেশি বলে জানিয়েছেন স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তারা।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে পার্বত্য জেলায় দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক শফিকুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, হাওর ও পার্বত্য জেলাগুলোকে সমতলের স্কুলের মতো দেখলে চলবে না। হাওর ও পার্বত্য জেলার শিক্ষার জন্য আলাদা পরিকল্পনার বিকল্প নেই। পার্বত্য ও হাওরাঞ্চলের অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। যেমন, প্রথম শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য পাহাড়ের ওপরে স্কুল তৈরি করে দেওয়া জরুরি। তার চতুর্থ থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য পাহাড়ের নিচে স্কুল নির্মাণ করা যেতে পারে। তা ছাড়া স্কুলের পাশেই শিক্ষকদের থাকার জন্য আলাদা কক্ষ নির্মাণ করা যেতে পারে। একই সঙ্গে একজন শিক্ষককে একাধিক ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। শিক্ষকের একাধিক ভাষা জানা থাকলে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের বোঝানো সহজ হবে। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার জন্য শিক্ষকদের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখতে হবে। সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানোর পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে অর্থাৎ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের ক্ষমতায়নেরও পরামর্শ দেন শফিকুল ইসলাম।

স্কুলে আসা-যাওয়ার সমস্যা নিয়ে কথা হয় রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার কংলাকপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী রণবিকাশ ত্রিপুরার সঙ্গে। রণবিকাশ কালের কণ্ঠকে বলে, আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে বাড়ি থেকে স্কুলে আসতে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় চলে যায়। স্কুল দূরে হওয়ায় যাতায়াতে মারাত্মক সমস্যা হয়।

রাঙামাটির রুইলুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিরণ বিকাশ চাকমা কালের কণ্ঠকে বলেন, শিক্ষার্থীদের স্কুলে আনার জন্য জনপ্রতিনিধি, শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষকদের নিয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন করা হলেও পার্বত্য জেলায় তা কার্যকর নয়।